উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণ

জয়িতা মুখোপাধ্যায়

উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এর ধারণা সমাজবিজ্ঞানীদের এবং অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় বহুদিন যাবৎ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পূর্বতন উপনিবেশ গুলির অবসান ঘটতে লাগল এবং এশিয়া,আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জন্ম হতে লাগল একের পর এক সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের, পাশ্চাত্যের গন্ডির বাইরে এই উদীয়মান তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রেক্ষাপটেও গুরুত্ব পেতে লাগল উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারনাটি, মূলত পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদেরই উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায়। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে যেতে লাগল একের পর এক। অর্থনীতিবিদদের এলাকায় ঢুকে পড়লেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা, তাদের মেধা, বিজ্ঞান ও প্রশিক্ষণ এর আলোতে যাচাই করে নিতে চাইলেন উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের তত্ত্বকে সমসাময়িক পরিস্থিতির নিরিখে।

বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারণার বিচার বিশ্লেষণ এক interdisciplinary (আন্তঃ শাখা) বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ শুরু হলো। শুধু তাই নয় তৃতীয় বিশ্বের এই নতুন স্বাধীন দেশগুলি যেহেতু তখন সংগ্রাম করছে উন্নয়ন, আধুনিকীকরণের লক্ষমাত্রা পূরণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রের আকাঙ্খাকে পূর্ণ করার, চেষ্টা করছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের - তাই উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সাথে যুক্ত হতে লাগল গণতন্ত্রীকরণের ধারণা। আলোচনা ও বিশ্লেষণ শুরু হলো এদের মধ্যেকার সম্পর্কের। একদিকে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীরা, David Apter থেকে Samuel P Huntington রা উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ও গনতন্ত্রীকরণের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে বিশ্লেষণ ও বিচার করার চেষ্টা করেছেন তাদের নানাবিধ বিদগ্ধ রচনায়, অপরদিকে রাষ্ট্রনেতারা এবং দেশনায়কেরা চেষ্টা করেছেন উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। সমাজবিজ্ঞানীদের দেখানো পথে হেঁটে, কখনো বা আবার বাস্তব পরিস্থিতি ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে পথ নির্বাচন করে তৃতীয় বিশ্বের অগুনিত মানুষকে তারা উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণের স্বর্ণালী লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেছেন। সেই প্রয়াসে কতটা সত্যনিষ্ঠা ছিল আর কতটা ছিল শুধুই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসমর্থন আদায় করে ক্ষমতা দখলের লড়াই, সেই বিতর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন। তুলনামূলক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং গণতন্ত্রীকরণের ধারণাগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং কিছু বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদের রচনার সারমর্ম অনুধাবন করার চেষ্টাই হলো এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

'উন্নয়ন', 'আধুনিকীকরণ' ও 'গণতন্ত্রিকরণ' এই তিন ধারণা (concepts) এত অজস্র তাত্ত্বিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে তাদের সবাইকে এই লেখায় স্থান দাওয়া সম্ভব নয়। তাই যাদের পরিচিতি বেশী, তাদেরকেই বেছে নেওয়া হবে। তবে এই প্রাথমিক মন্তব্য করা যতেই পারে যে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে

যতই পার্থক্য থাক, সকলেই উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ও গণতন্ত্রিকরণের গুরুত্ব ও রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে তাদের আবেদন নিয়ে সহমত। রাষ্ট্রনেতা এবং রাজনীতিবিদরা দক্ষিণপন্থীই হোন বা মধ্যপন্থী বা বাম পন্থী, এই ধারণাগুলি তাদের কণ্ঠেও ক্রমাগত উচ্চারিত হতে থাকে। ২০১৮র ভারতবর্ষে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এর সারাজাগানো শ্লোগান ভোটও কুড়িয়েছে, আর বিদ্রুপের নিশানাতেও রয়েছে। আর দেশের প্রতিটি প্রান্তের নেতারা সে তিনি যে দল বা মতবাদের মানুষই হোন না কেন, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তারা উন্নয়নের পক্ষে, আধুনিকীকরণের পক্ষে এবং গণতন্ত্রের প্রসারের পক্ষে। তবে কার উন্নয়ণ, উচ্চবর্ণের, ব্যবসায়ীর, কয়েকটি স্বার্থ শ্রেণীর, বিরাট শিল্পপতির, নাকি দরিদ্র কোণঠাসা মানুষের ও মহিলাদের, কি ধরণের আধুনিকীকরণ, কৃষির বিনাসের মূল্যে শিল্পে, নাকি ক্রমবর্ধমান যন্ত্রনির্ভরতার, কার জন্য গণতন্ত্র, উচ্চবর্ণের, উচ্চবিত্তের, সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য না ক্রমশঃ কোণঠাসা হতে থাকা সংখ্যালঘু দলিত, শ্রমিক কৃষক ও মহিলাদের, সেই সব অস্বস্তিকর প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে থাকা এই ধারণাগুলি তাই বহুমাত্রিক এবং বিতর্কিত। তাই এদের সঠিক বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

উন্নয়ন

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যবে থেকে মানুষ আদিম অবস্থা কাটিয়ে সভ্যজীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, আত্মসচেতন হয়েছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, সম্ভবত সেই সময় থেকেই সে নিজের , পরিবারের ও সমাজের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তাও শুরু করেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাবের পর উন্নয়ন সংক্রান্ত তত্ত্ব নির্মান ও আলোচনায় এক বিশেষগতি আসে। এই তত্ত্বগুলির অন্তত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

'সামাজিক পরিবর্তন' এর ধারণাঃ

কিছু বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়নকে সামাজিক পরিবর্তন এর সমার্থক হিসাবে দেখিয়ে তাদের মত এবং ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন John G Gunnell তাঁর মতে , সামাজিক চিত্রের এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, তদনুরূপ আচরণের পরিবর্তন এবং সার্বিক সচেতনতার বৃদ্ধিই হল উন্নয়ন। (Gunnell: 1970) অর্থাৎ Gunnell ও তার সহ চিন্তাবিদদের কাছে চিন্তা ও কার্যে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন ঘটলে তবেই তাকে প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চিন্তার সাথে কাজের যোগাযোগ এখানে লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সালেই অন্তত আইনগত ভাবে অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটিয়েছে। বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশ জাতিভেদ প্রথা তথা অস্পৃশ্যতাকে এক ঘৃণিত সামাজিক প্রথা হিসাবে অন্তত জনসমক্ষে সজোরে ধিক্কার

জানিয়েছেন। কিন্তু আজও বিবাহ ও আরও নানবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে তথাকথিত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ করা হয়। কথা বা চিন্তা এবং কাজের এই ফারাক ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশ্ন চিহ্ন রেখে যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বের মধ্যেও আবার অনেক রকমফের আছে। Karl Marx, August Comte, Herbert Spencer এবং L.T. Hobhouse এর মতো চিন্তাবিদেরা সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে সরলরেখায় চলতে থাকা ঘটনা (linear change) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে Karl Marx দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজ ক্রমশ উন্নততর ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যায়। August Comte, Herbert Spencer এবং L.T. Hobhouse রাও রৈখিক পরিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী তবে তারা বিভিন্ন আভ্যন্তরীন বিষয় যেমন সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও মননের পরিবর্তন এবং বাহ্যিক বিষয় যেমন শিল্পোন্নয়ণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ প্রভৃতির যৌথ ফসল হিসাবে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আবার শিল্পায়ন, যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ, বিশেষীকৃত সামাজিক কাঠামোর বিকাশ সত্ত্বেও যেভাবে অনেক সমাজেই আদিম, রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণা টিঁকে থাকে এবং অনেক সময় শক্তি বৃদ্ধিও করে তার পরিপ্রেক্ষিতে Vilfredo Pareto, Pitirim Sorokin এবং Arnold Toynbee মতো চিন্তাবিবদরা রৈখিক পরিবর্তনের বদলে চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্বকে (cyclical change) বেশী উপযোগী মনে করেছেন। অর্থাৎ প্রগতি, উন্নতি, অবনতি চক্রাকারে আসে বলে তারা মত দিয়েছেন, (Ogburn,1922) ভারতে সাত দশক ধরে শিক্ষার প্রসার ও শিল্পায়ন, নগরায়ণ ইত্যাদির ফলে বৌদ্ধিক ও মানবিক পরিবর্তনের নানা লক্ষণও দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিককালে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, কুসংস্করাচ্ছন্ন নানা ধারণার ও আচরণের প্রভাব অত্যন্ত আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চক্রাকার পরিবর্তনের ধারণাকেই হয়তো অনেকে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করবেন।

আর্থিক উন্নয়ন তত্ত্বঃ উন্নয়নকে আর্থিক উন্নয়নের সমার্থক ভাবার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন বহু সমাজ বিজ্ঞানী। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ Adam Smith মনে করেছিলেন মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে মূলধন বাড়বে এবং কমবে দারিদ্র এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়নও ঘটবে। কার্ল মার্কসের মত ছিল যে পুঁজিবাদী সমাজ

উন্নত হওয়ার সাথেসাথে আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ভারে ভেঙে পড়বে। আর সমাজতন্ত্র গঠিত হবে যা আর্থিক উন্নয়নকে পৌঁছে দেবে অপামর জনসাধারণের কাছে। Alfred Marhal, Vilfredo Pareto ও তাদের কিছু সহযোগী অবশ্য মত দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং পাশাপাশি রাষ্ট্র অর্থনীতির পরিচালনায় সদর্থক ভূমিকা নেবে, ততই উন্নয়ন গতিশীল হবে। Joseph P Schumpeter জোর দিয়েছেন 'আর্থিক বৃদ্ধি'র ধারনার ওপর যাকে তিনি অসম, অস্থির এবং চক্রাকারে পরিবর্তিত হওয়া আর্থিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া থেকে পৃথক ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, আর্থিক বৃদ্ধি ঘটে ধীরে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে, স্থিতিশীল ভাবে, আর প্রযুক্তি হল আর্থিক বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি এবং উদোগপতিরা (enterpreneur) হলেন বৃদ্ধির ধারক ও বাহক (Schumpeter:1961)।

রৈখিক আর্থিক বৃদ্ধির ধারণা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গৃহিত Marshall পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে তাত্ত্বিকদের বিশ্বাস জন্মায় যে সরকারীক্ষেত্রে বিপুল অর্থবিনিয়োগ করলে এবং তার সদ্ব্যবহার হলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিল্পায়ণ ও আর্থিক বৃদ্ধি ঘটবে। এই তত্ত্বটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন Walt W Rostow তাঁর Five Stages of Growth তত্ত্বের মাধ্যমে। আর্থিক বৃদ্ধির যে পাঁচটি পর্যায়কে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলি হোলো প্রাচীন/প্রথাগত পর্যায়(traditional stage) পরিবর্তনশীল পর্যায় (transitional) উত্তরণ পর্যায় (Maturity stage) এবং গণ-উপভুক্তি পর্যায় (Mass consumption stage) Rostow র মতে Mass consumption stage এ পৌঁছে যাওয়ার পর একটি দেশের সামনে অনেক রাস্তা খুলে যায়। যে নিজেকে একটি আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে এগিয়ে যেতে পারে অথবা জন কল্যানকামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে বা আরও বেশী ভোগবাদী হয়েউঠতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞর মতে ভারত ও অন্য উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি এখনও take off stage এ রযেছে। (Rostow: 1962)।

Rostow র ধারণার যে ত্রুটিটি বিশেষজ্ঞদের বিচলিত করেছে, সেটি হল উন্নয়নের প্রক্রিয়া ঘটছে যে দেশগুলিতেসেগুলিকে সমজাতীয় দেশ হিসাবে ভাবা। উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক পরিকাঠামো, মূল্যবোধ, নেতৃত্বের গুণগত মান প্রভৃতি বিষয়গুলি উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে, তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সমজাতীয় ভেবে নেওয়া নিতান্তই বিভ্রান্তিকর বলে সমালোচকরা মনে করেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদদের কাছে আর্থিক উন্নয়নের মাপকাঠি ছিল জাতীয় আয় বা (National Income) এবং সার্বিক জাতীয় উৎপাদনের মাথাপিছু হার (Gross National Produt Per

Capita) অর্থাৎ বিনিয়োগ হওয়া মূলধনকে (capital) কাজে লাগিয়ে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার সাহায্যে যে উৎপাদন ঘটে, তার অনুপাতই হল উন্নয়নের মাপকাঠি। কিন্তু সত্তরের দশকে, মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রেক্ষাপটে এই মাপকাঠির সীমাবদ্ধতা খুবই প্রকট হয়েওঠে। GNP বাড়লেও দেশের জনসংখ্যার ব্যাপক অংশের জীবনযাপনের মানের উন্নতি চোখে না পড়ায় উন্নয়নের সূচকগুলি নতুনভাবে নির্ধারিত হয়। অর্থ ও সম্পদের সঠিক, নায্য বন্টন, মানব সম্পদের উন্নত ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও পাশাপাশি পরিবেশের সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলিও উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। উন্নয়নের ধারণা বহুমাত্রিক হয়ে ওঠার ফলে শুধু আর্থিক উন্নয়নকে জরুরী ভাবার প্রবণতা হ্রাস পায়। বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে টিকে ধাকা উন্নয়ণ / স্থায়ী উন্নয়ন (Sustaniable Development) এবং মানবজীবনের উন্নয়ন (Human Development) এই ধারণা দুটি বিশেষভাবে বিবেচ্য।

লাগাম ছাড়া শিল্পোউৎপাদন, জৈব জ্বালানীর ব্যবহার ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে মানবজাতির জীবনে যে সংকট ঘনিয়ে আসছিল, সে সম্পর্কে ৭০এর দশকে পাশ্চাত্যে সচেতনতা বাড়তে থাকে। Climate change বা জলবায়ুর পরিবর্তন যে অনেকটাই বেপরোয়া মানবিক হস্তক্ষেপের কারণ এবং এর ফলে পরিবেশের যে নিদারুণ ক্ষতি হচ্ছে, তা যে সাংঘাতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, সে সম্পর্কে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা ক্রমশ সচেতন হচ্ছিলেন এবং তারা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যে উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছে, তাও আত্মধ্বংসেরই পথ। তাই পুর্ণনবীকরণযোগ্য জ্বালানীর ব্যাবহার বাড়ানো, উৎপাদন, শিল্পনায়ন তথা নগরায়ণের গতিকে কিছুটা কমিয়ে আনা, পরিবেশের সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্ব পেতে শুরু করে এবং তারই ফল হিসাবে Sustainable Development এর ধারণা উঠে আসে। ১৯৮৭ সালে United Nations World Commission on Environment and Development এর তরফে 'Our Common Future' নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা Brundtland Report নামে জনপ্রিয় হয়। এই প্রতিবেদনে Sustainable Development কে ব্যখ্যা করে বলা হয় 'Sustainaible Development is Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Website of International Institute of Sustainable Development) অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে, বর্তমানের প্রয়োজন মটোনো হলো স্থায়ী উন্নয়ন। এই ধরণের উন্নয়নের জন্য চাই আরও বেশী বিনিয়োগ, বিশেষত উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ যা প্রায়শই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে খুব বেশী ব্যয়সাধ্য, আর প্রয়োজন ভোগবাদী চাহিদার কিছুটা সংকোচন। আরও বেশী কংক্রিটের শহর, গাছ কেটে জলাভূমি

বুজিয়ে আরও বেশি বসতি , শপিংমল আর আধুনিক পরিষেবার চাহিদাকে সীমিত না করলে পরিবেশকে বাঁচানো যাবে না আর পৃথিবীর বিপদও ঘনিয়ে আসবে, এই বোধ জাগ্রত হওয়া খুবই প্রয়োজন। এই ধরনের উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে গেলে আরও প্রয়োজন উত্তর ও দক্ষিনের দেশগুলির মধ্যে সঠিক সগযোগীতার পরিবেশ। (North-South Cooperation) দীর্ঘ উপনিবেশিক শোষণের দিনগুলিতে উত্তরের দেশগুলি নানাভাবে শোষণ করেছে দক্ষিণের দেশ গুলিকে। তাই আজ এটাই কাম্য যে অর্থ দিয়ে, প্রযুক্তি দিয়ে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করবে যাতে পৃথিবীর উষ্ণায়ন সীমিত করা যায় আর Sustainable Development এর লক্ষও পূরণ করা যায়। তবে ২০১৭ সালে প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্র্যাম্প, যার মমার্থ হল পরিবেশে তথা জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যয়ভার বহন করবে না। এ জাতীয় অবস্থান মানবজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

উন্নয়নকে শুধুমাত্র আর্থিক উন্নয়নের সমার্থক না ভেবে মানবিক দৃষ্টিথেকে বিবেচনা করে এক নতুন তত্ত্বের জন্ম দেন বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এবং পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ মেহবুব উল হক। উন্নয়নকে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের সাথে যুক্ত করে এরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে মানুষের মুল চাহিদা মেটানো, তার জীবনযাপনের মানের উন্নতি, শিক্ষা, জীবিকা, প্রভৃতির সুযোগ, তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, পচ্ছন্দের জীবন বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা এবং সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার সুযোগ বৃদ্ধিই হল প্রকৃত উন্নয়ন। তাদের গবেষণা লব্ধ মানব উন্নয়নের সূচক (Human Development Index) ২০১০ সালে UNDP (United Nations Development Programme) দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের উন্নয়নের সঠিক চিত্র পাবার এক গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত এবং সমাদৃত হয়। তাই বলাই বাহুল্য, উন্নয়নকে শুধু মাত্র আর্থিক উন্নয়নের সমার্থক ভাবার প্রবণতা তার গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়েছে।

রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব

ষাট এবং সত্তরের দশকে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের রচনাতে রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বটি খুবই প্রচলিত ও চর্চিত হয়। মূলত এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরকিার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতে কিভাবে উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ধারণা হিসাবে রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটিতে আলোচিত হতে থাকে। যদিও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথা

সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা ও মতবাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবুও সামগ্রিকভাবে সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে গণতন্ত্রের প্রসার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক বৈধতা, রাজনৈতিতে গণ অংশগ্রহণের প্রসার, নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম, সমতা ও সক্ষমতার প্রসার, রাজনৈতিক কাঠামোর পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ, জনগণের জাতিগত, সংস্কৃতিগত পরিচয়ের সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের প্রসার, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সম্প্রসারণ, প্রভৃতিকেই মূলত ভাবা যায়। বলাই বাহুল্য এই লক্ষ্যগুলি পাশ্চাত্যের সমাবিজ্ঞানীদের নিজস্ব পছন্দ ও মূল্যবোধের পরিচয়বাহক।

এই রাজনৈতিক উনন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও আলাপ আলোচনার মধ্যে মূলত তিনটি স্রোত বা তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলি হল তুলনামূলক ইতিহাসের তত্ত্ব (Comparative History Approach) কাঠামো কার্যবাদ তত্ত্ব (structural functional Approach) এবং সামাজিক প্রক্রিয়া তত্ত্ব (Social Process Approach)।

তূলনামূলক ইতিহাস তত্ত্বের এক অন্যতম প্রবক্তা হলেন Lucian W. Pye. রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে যে বিষয়গুলিকে তিনি জরুরী মনে করেছেন, সেগুলি হল -

ক) আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন।

খ) শিল্পনির্ভর সমাজের উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

গ) রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ।

ঘ) জাতিরাষ্ট্রের (Nations State) উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঙ) প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার উন্নতি।

চ) জন সঞ্চালন (Mass mobilization) এবং রাজনীতিতে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ।

ছ) গণতন্ত্রকে গড়ে তোলা।

জ) স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্ত ন আনয়ন।

ঝ) বহুমাত্রিক সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা (Pye, 1966)।

Pye সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সমতা, সক্ষমতা ও পৃথকীকরণ (Equality, Capacity

and Differentiation), এই তিনটি ধারণার প্রয়োগের ওপর। ভারতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা গেছে যে সামাজিক সমতাকে বাস্তবায়িত করা রাষ্ট্রনায়কদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংবিধানিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও দরিদ্র, বিপন্ন মানুষ এমনকি প্রশাসনের কাছ থেকেও সাহায্য সুবিধা বা প্রতিকার পাননি। দেশের সুবিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক স্নাতক তৈরী হয় ভারতে কিন্তু দুঃখজনক ভাবে প্রকৃত সামর্থের (capacity i.e technical skill, employability) অভাবে তারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মহিলা দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আজও আমরা অনেকটা পিছিয়ে। আর পৃথকীকরণ আর্থাৎ নির্দিষ্ট কাঠামো নির্দিষ্ট কাজ করবে, অন্য কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ করবে না, সেইরকম পরিস্থিতিও আজও তৈরী হয়নি। উদাহরণস্বরূপ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে রত পুলশিবাহিনী নীতিরক্ষক এর ভুমিকায় অবতীর্ণ, যুবক-যবতীদের প্রেমঘটিত ঘনিষ্ঠতা রোধ বা অসবর্ণ বিবাহ ভন্ডুল করার মত দায়িত্ব নির্বাহ করতে দেখা যায় পুলিশ কে যা একেবারেই অভিপ্রেত নয়।

কাঠামোকার্যবাদের অন্যতম প্রধান দুই প্রবক্তা Gabriel Almond এবং G.B. Powell এর মতে রাজনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি যাতে সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্র ও জাতির সামনে যে সব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য সফলভাবে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারে এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তার সাথে সাথে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করে দিতে পারে। তারা আরও মন্তব্য করেছেন যে কাঠামো ও অঞ্চলগত পৃথকীকরণ (structural & Zone differentiation) উপব্যবস্থার স্বাধিকার (subsystem autonomy) এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে মুক্তকরা (secularization of political culture) এই প্রক্রিয়াগুলির যৌথ ফসল হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন যার প্রতিফলন ঘটে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান কার্যকারিতার (Effectiveness) ওপর, (Almond & Powell 1966)

রাজনৈতিক উন্নয়নকে এক বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে ভেবেছেন যে সব বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীরা, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Samuel P Huntington হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক তথা খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Samuel P Huntington তৃতীয় বিশ্বকে ভেবেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন নানাভাবে এবং সময়ের সাথে সাথে নিজের মতের কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনও করেছেন। রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে রৈখিক ভাবতে তিনি নারাজ আর উন্নয়নকে

আধুনিকীরণের সমার্থক ভাবার পশ্চিমী প্রবণতারও তিনি বিরোধী। তার মতে, রাজনৈতিক উন্নয়নের সারমর্ম হোলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানীকরণ। (Institutionalzation of political organizations and procedures)(Hungtington 1965)

Hungtington এর মতে যত বেশী প্রতিষ্ঠানিককরণ ঘটবে, ততই রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিণত হবে, ন্যায়সঙ্গত হবে, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে অনেক বেশী দক্ষতার সাথে। প্রতিষ্ঠান আইনের শাসন কায়েম করে, ব্যক্তিকে পরিষেবা, সুযোগ সুবিধা ও ন্যায়দানের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে চলে, তাই প্রতিষ্ঠানের শাসন রাজনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রীকরণের উপযোগী। ভারতের উদাহরণ দিয়ে আবারো দেখানো যায় সংবিধান চালু হবার পর পার্লামেন্ট সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের মত প্রতিষ্ঠান গুলি অনেকটাই সফল হয়েছে আইনের শাসন (Rule of Law) প্রতিষ্ঠা করতে যা ভারতীয় গণতন্ত্রকে কিছুটা স্থিতি ও গ্রহণ যোগ্যতা দিয়েছে তবে সাম্প্রতিককালে সেভাবে ব্যক্তিপূজার প্রচলন করার প্রয়াস চলছে, যেভাবে প্রতিষ্ঠানগুলিকে হয় এড়িয়ে চলা হচ্ছে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের জোর খাটিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থের কাছে মাথানিচু করতে বাধ্য করা হচ্ছে, তা ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মহিমাকে অনেকটাই কালিমালিপ্ত করছে।

আধুনিকীকরণ

উন্নয়নের ধারণাকে বহুক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ (Modernization) এর সমার্থক ভেবেছেন পাশ্চাত্য তথা তৃতীয় বিশ্বের বহু সমাজবিজ্ঞানীরা। কিছু সমাজবিজ্ঞানী যেমন Daniel Lerner, Alex Inkles ও Monte Palmer দের মতে আধুনিকীকরণের প্রকৃত ক্ষেত্র হল সমাজ অর্থাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটলে তবেই আধুনিকীকরণ ঘটে। (Bava , 1981) David Apter, এক বিশিষ্ট মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেছেন রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ হলো সামগ্রিক আধুনিকীকরণের মূল স্তম্ভ। Apter এবং তার সমগোত্রীয় একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যেমন Myron Weiner, C.E. Black ও আরও অন্যন্যরা পশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার আলোকেই তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সার্বিক শিক্ষার প্রসার, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অমলাতান্ত্রিক প্রাশাসন ব্যবস্থার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি, জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবাদী সাংস্কৃতির প্রসার ইত্যাদি হল এনাদের কাছে একটি সমাজের আধুনিক হযে ওঠার সূচক। এই এক ই সূচককে তারা উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবেও বিশ্লেষণ করেছেন। তাই

উন্নয়ণ ও আধুনিকীকরণ এদের কাছে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। David Apter এর রচিত The Politics of Modernization বইটি 1965 সালে প্রকাশিত হবার পর থেকেই উন্নয়ণ ও আধুনিকীকরণের যোগাযোগের বিষয়টি, বিশেষত তৃতীয়বিশ্বে এই দুই প্রক্রিয়ার প্রয়োগযোগ্যতা বহু সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

Apter আধুনীকিকরণের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখা ও বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিশেষ সূত্র নির্ধারণ করেছেন। প্রথমত, তাঁর মতে আধুনিক হয়ে ওঠা সমাজে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও কাজে ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বৈচিত্র লক্ষ্যকরা যায়। আর তাই নানা ধরণের কাজ ও ভূমিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য স্থাপন খুবই সমস্যাবহুল হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, প্রাচীন চিরায়ত সমাজের তুলনায় আধুনিক ওয়ে উঠতে থাকা সমাজে নানা জীবন শৈলী, নানা পেশা, নানা ভূমিকার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দের কাজ ও ভূমিকা বেছে নাওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত যুক্তিবোধের মাধ্যমে লক্ষ ও লক্ষপূরণের পথকে বেছে নেওয়া সম্ভব হয় আধুনিক হয়ে ওঠা সমাজে। Apter তার বইয়ে আধুনিকীকরণ ঘটানোর তিনটি আলাদা পথের (approches) ও নির্দেশ দিয়েছেন। কাঠামো কার্যবাদের উল্লেখ করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলির বিশেষীকরণের মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ ক্রমশ একটি কাঠামো একটি বিশেষ কাজে নিযুক্ত হবে) আধুনিকীকরণ সম্ভব। তৃতীয়ত আচারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করে তিনি মত দিয়েছেন যে সামাজিক ক্রীড়করা (রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনেতা, প্রতিষ্ঠানে কর্ণধর, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষ) তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিকতা, ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক মনস্ক হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং তাতেও সামগ্রিক আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে। চতুর্থত, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করে Apter বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন ও দেখাতে চেয়েছেন আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া মানবজীবনের কতটা উন্নতিসাধন, কল্যাণসাধন করতে পারে, কিভাবে পারে এবং তাই কিভাবে আধুনিকীকরনের লক্ষেএগোন যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর উন্নয়ণ, আধুনিকীকরণের পাশাপাশি গণতন্ত্রীকরণের চেষ্টাও শুরু করে কিন্তু তাদের অনেকে কিছু বছর পর গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পথ বেছে নেয়, তখন Apter তাদের এই পরিণতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে শুধুমাত্র নৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক পথই যে আধুনিকীকরণের পথ তা নয়। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীরাও আধুনিকীরকরণ ঘটাতে পারে। সাম্প্রতিক ভারতের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, Digital India , Skill India ইত্যাদির প্রসার আধুনিকীকরণ, উন্নতপ্রযুক্তি ও উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে আমাদের অগ্রগতির সূচক হতে পারে। কিন্তু তারা কি এই বার্তা দেয় যে ভারত আরও বেশী উদারনৈতিক একটি দেশ হয়ে উঠছে?

আধুনিকীকরণ মানেই গণতন্ত্রের প্রসার, পাশ্চাত্যের কিছু চিন্তাবিদের সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন Apter তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

অবশ্য Apter দ্বারা প্রচারিত প্রাচীন ও আধুনিক, উন্নত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে বিভাজন (Dichotomous approach) এর নীতি যথেষ্ট সমালোচিতও হয়েছে। উন্নয়নের প্রক্রিয়া সত্ত্বেও যে প্রাচীন ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ বেচে থাকে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে আধুনিকীকরণ ঘটালেও যে কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও আচার আচরণ দূর হয়না, ভারত ছাড়া আরও অন্য অনেক দেশ তার সাক্ষ্য বহন করে। তাই আজও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি ঝারফুঁকও চলে সহরে ও গ্রামে। কিছু মহিলা শিক্ষা ও জীবিকার নতুন সুযোগ পেলেও অনেকের কাছেই সংসারের কাজে জীবন কাটানোই একমাত্র জীবনশৈলী। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে উন্নয়ন আর আধুনিকীকরণের সম্পর্কে নানাবিধ টানাপোড়েন রয়েছে। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা গেলেও সংস্কৃতি, মনন ও জীবনশৈলীতে আধুনিকীকরণ এর পথে অনেক বাধা রয়ে গেছে যা সুদীর্ঘ এবং ধারাবাহিক প্রয়াসের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

গণতনন্ত্রীকরণ

উপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি যখন দেশগঠন ও জাতিগঠনের কাজে লিপ্ত হয়, তখন উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সাথে যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যটিকে তারা নির্বাচন করে সেটি হল গণতন্ত্রীকরণ, অথাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সাধারণ মানুষ তথা রাজনিতীবিদদের জীবন ও কর্মপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলা। উন্নত জীবনযাপন স্বাধীন জীবনের প্রতি এই আকাঙ্খাকে সমাবিজ্ঞানীরা বর্ণনা করেছেন ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার বিপ্লব হিসেবে। (Revolution of Rising Expectations) Alex de Tocqueville এর ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ The Old Regine and the French Revolution থেকে বেছে নেওয়া এই বাক্যাংশটি সুদীর্ঘ পরাধীনতার অবসানের পর তৃতীয় বিশ্বের মানুষের আশা, স্বপ্ন ও চাহিদার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত। পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে সুদূর লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার নতুন সার্বভৌম দেশগুলি তখন সত্যিই শুরু করেছে ভালভাবে বাঁচার লড়াই। যদিও এই লড়াই কখনো এনেছে সাফল্য, কখনো ব্যর্থতা। কখনো এক ধাপ এগুনো গেছে উন্নতি ও গণতন্ত্রের দিকে, কখনোও বা কয়েক ধাপ পিছনে গিয়ে স্বৈরতন্ত্র ও অনগ্রসরতার কবলে পড়েছে নতুন স্বাধীনভাবে

চলতে থাকা দেশগুলি।

এই অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্যের সমাবিজ্ঞানীরা নানা রকম লেখা ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ হল বিখ্যাত হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক Samual P Huntington এর প্রবন্ধ Democracy's Third Wave, যা Journal of Democarcy র Spring 1991 সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পরই বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে রীতিমত সাড়া ফেলে দেয়। এই বইতে Huntington 1974 থেকে 1990 র মধ্যে দক্ষিণ ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের তিরিশটিরও বেশী দেশে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানকে গণতান্ত্রিকরণের তৃতীয় ঢেউ (Third wave of Democratization) বলে বর্ণনা করে এই প্রক্রিয়াকে বিংশ শতাব্দীর এক অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা বলে চিহ্নিত করেন। প্রবন্ধটিতে Huntington গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের (Democratization) প্রধান কারণ এবং পরিবর্তনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন, এই নতুন গণতন্ত্রগুলি কতটা স্থায়ী হবে সেটা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের আরও প্রসার ঘটবে কিনা সেবিষয়ে আলোকপাত করারও চেষ্টা করেছেন।

প্রবনন্ধটির শুরুতেই Hungtington বলেছেন যে অতীতেও দুবার বিশ্বরাজনীতিতে গণতান্ত্রীকরণের ঢেউ এসেছিল। ১৮২০ তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটদানের অধিকারের বিস্তারের মধ্য দিয়ে শুরু হয় first wave of democratization যা প্রায় ১৯২৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং ২৯টি নতুন গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। তবে ১৯২২ সালে ইটালীতে Mussolini ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয়ে reverse wave বা উল্টো প্রক্রিয়া যার ফলে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের সংখ্যা কমতে থাকে এবং ১৯৪২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১২টিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয় লাভ করার পর দ্বিতীয় পর্যায় (Second wave of democratization) এর সূত্রপাত হয় এবং ১৯৬২ সালে পৃথিবীতে ৩৬টি গণতান্ত্রিক দেশের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় হয়। তবে আবারও ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ এর মধ্যে reverse wave লক্ষ্য করা যায় যার ফলে গণতন্ত্রের সংখ্যা আবার হ্রাস পেয়ে ৩০এ নেমে আসে।

Huntington এর মতে Third wave এর সূত্রপাত ঘটেছে ১৯৭৪ এ পর্তুগাল এ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর। ১৯৯০ এ প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি মন্তব্য করেন যে Third reverse wave ও হয়তো শুরু হতে চলেছে কারণ হাইতি, সুদান এবং সুরিনাম এই তিনটি দেশে আবারও অগণতান্ত্রিক,

কর্তৃত্ববাদী (authoritarian) সরকার ব্যবস্থা ফিরে এসেছে।

Huntington এর প্রবন্ধের একটি সমালোচনামূলক গবেষণা পত্রে (Doorenspleet :2000) লেখক দেখিয়েছেন যে Huntington গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন Robert Dhal এর ধারণা অনুযায়ী। তার কাছে প্রতিযোগীতা (comptetion) সামাজিক ব্যপ্তি (inclusiveness) এবং নাগরিক স্বাধীনতা (civil liberties) হল গণতন্ত্রের মাপকাঠি। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম জরুরী বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের প্রয়োগের বিষয়টি Huntington কিছুটা উপেক্ষা করেছেন যা তার বিশ্লেষণকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলেছে। এছাড়াও সমালোচকরা আরও বলেছেন যে গণতন্ত্রের প্রসার যেমন ঘটেছে, পাশাপাশি অনেক রাষ্ট্র অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও স্বীকার হয়েছে তাই একটি ঢেউএর পর উল্টো ঢেউএর ধারণা খাটে না। কারণ প্রগতি ও অবনতি একই সময় পাশাপাশি লক্ষ্য করা গেছে।

তৃতীয় ঢেউ বা Third wave এর আলোচনা প্রসঙ্গে Huntington বলেছেন যে Catholic Church এর ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীল ভূমিকা, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরোধীতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতি এবং ঠান্ডাযুদ্ধজনিত উত্তেজনার অবসান গণতন্ত্রিককরণের প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল করবে, আর তাছাড়াও একটি দেশে গণতন্ত্র আসার পর অন্য দেশ ও তার জনগণ স্বাভাবিক ভাবেই এই ব্যবস্থা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তাই demonstration effect বা snowballing এর কারণেও গণতন্ত্রের আরও প্রসার ঘটবে।

তবে গণতন্ত্রীকরণের বিপরীত হাওয়া অর্থাৎ অগণতান্ত্রীক কর্তৃত্ত্ববাদী স্বৈরাচারী ব্যবস্থার ফিরে আসার সম্ভাবনার ব্যাপারে Huntington চিন্তিত ছিলেন এবং কি কি কারণে এই reversewave বা উল্টোপ্রক্রিয়া ঘটতে পারে সেগুলিকেও তিনি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি যদি মানবকল্যাণ, প্রগতি, সাম্য, ন্যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সুরক্ষিত করতে না পারে এবং বাহ্যিক শক্তির অনুপ্রবেশ রোধ করতে না পারে, তাহলে তারা দ্রুত তাদের বৈধতা (legitimacy) এবং গ্রহণযোগ্যতা হারায় এবং সেক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী বা গণতন্ত্রবিরোধীশক্তি ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পায়। কিছু কিছু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন চীন, গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করলেও আর্থিকভাবে দ্রুত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে আর ফলে তারা নিজেদেরকে গণতন্ত্রের থেকে বেশী কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে কিছুটা সফলও হয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসার, তথ্যসরবরাহ ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিও গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার সামনে বড় বাধা বলে Huntington চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া তৃতীয় বিশ্বের

রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠা ও আস্থার অভাব, কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক ও ব্যক্তি তথা গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষা করার প্রবণতাকেও Huntington অন্তরায় বলে মনে করেছেন। কিছু তৃতীয় বিশ্বের দেশের পিতৃতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী সংস্কৃতিও (culture) গণতন্ত্রিকরণের অনুকূল নয় বলে Huntington এর ধারণা। এছানা ব্যক্তিপূজার প্রচলন (personality cult) এক যোগে কাজ করার মানসিকতার (team spirit) অভাব, প্রভৃতিও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি মনে করেন। তবে এসব অসুবিধা সত্ত্বেও Huntington গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আশাবাদী। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রিকরণের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা রয়েছে Huntington অনেকটাই তাকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন। আজকের পৃথিবীতে বিশেষত ভারতের প্রেক্ষাপটে এদের সম্পর্কের টানাপোড়েন সমাজবিজ্ঞানীদের খুবই চিন্তিত করে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবা হয়েছিল যে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কাজের সুযোগ মানুষকে গণতন্ত্রপ্রেমী করে তুলবে। কিন্তু দেশে বিদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করে গোষ্ঠীর দাবি ও মূল্যবোধের আধিপত্য কায়েমে ইচ্ছুক দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও গোষ্ঠীর প্রভাব যেভাবে বাড়ছে তাতে উন্নয়ণ গণতন্ত্রকে প্রসারিত করবে সেই দাবী তার আবেদন হারাচ্ছে। জাতিগত পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও আগ্রাসী দেশত্মবাদী মনোভাব, যার সাথে জড়িত রয়েছে অপর গোষ্ঠী জাতি ও রাষ্ট্রের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ক্রমশই গণতান্ত্রিক পরিসরকে সংকুচিত করছে, এমনকি সেই সব তৃতীয় বিশ্বের দেশেও যেখানে পরিসংখ্যান দাবি করছে যে উৎপাদনের এবং জীবনযাপনের মানের উন্নয়ণ ঘটছে চোখে পড়ার মতো। তবে কি উন্নয়ন মানুষকে আরো লোভী, আত্মকেন্দ্রিক ও পরশ্রীকাতর করে তুলছে? হয়তো সময় এসেছে উন্নয়নকে জীবনযাত্রার মানের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও সহযোগীতার মানসিকতার উন্নয়ন হিসাবে চিন্তা করার।

পরিশেষে; Huntington উপযুক্ত নেতৃত্বের উপরে বিশেষ আস্থা রেখেছিলেন তবে ভারতের মতো দেশের অভিজ্ঞতা প্রমান করে যে অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতারা অনেক সময়ই গণতন্ত্রের বাহক হতে পারেন না এবং উল্টোদিকে দুর্বল নেতারাও গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষায় ব্যর্থ হন। তাই বিশ্লেষকরা মনে করেন যে জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার, ব্যক্তির ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রিক উদ্যোগ ও তৎপরতাই হয়ত (public activism) গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারে।